দর্শনের বর্ণপরিচয় - প্রথম ভাগ

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

দর্শন মানে কী?

'দর্শন' মানে দেখা।

এইটুকু বললে অবশ্য কিছুই বোঝায় না। চোখ থাকলেই দেখা যায়। কিন্তু সব দেখাই কি ঠিক দেখা? রোজই তো দেখছি, সূর্য পূর্বদিকে উঠছে, আর পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে। বহুকাল ধরে লোকে বিশ্বাসও করে এসেছে: সূর্যই পূর্বদিকে উঠছে, আর পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে। বহুকাল ধরে লোকে বিশ্বাসও করে এসেছে: সুর্যই ঘোরে, পৃথিবী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ আরও একধাপ এগিয়ে কল্পনা করেছিল সুর্য একজন দেবতা, রোজ সকালে সাতরঙা ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে তিনি আকাশের এমাথা থেকে ওমাথা ঘুরে বেড়ান।

এই কল্পনাটা এসেছিল কোত্থেকে? উত্তর: লোকে যা দেখেছিল তার থেকেই। সাতটা রঙকে ভাবা হয়েছিল সাতটা ঘোড়া, আর সুর্যই যেন সেই ঘোড়ায় টানা রথ চালাচ্ছেন।

আমরা এখন জানি: এর সবটাই ভুয়ো। সূর্য একটা বিরাট তারা। পৃথিবী সমেত নটা গ্রহ তাকে ঘিরেই ঘুরছে।

এটা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি?

না! সাদা চোখে দেখা বলতে যা বোঝায়, তেমন দেখা দেখছি না।

তার মানে: দেখারও রকমফের আছে। চোখে দেখাই একমাত্র দেখা নয়। সাদা চোখে যা দেখা যায় না তাও ধরা পড়ে অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে। আবার কোনো যন্ত্রেই যা ধরা পড়ে না এমন ছোটো বা বড় জিনিসেরও হদিশ পাওয়া যায় অঙ্ক কষে। সেটাও এরকমের 'দেখা'।

জগৎ ও জীবনকে নানাভাবে দেখা যায়। তার থেকেই তৈরি হয় এক এক ধরণের দর্শন।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্তের প্রকৃতির মধ্যে যে -পরিবর্তন দেখা যায়/চোখে পড়ে, তাকে কি শুধুই একটা সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা বলে মানব? নাকি তার পেছনে কোনো দেবতা বা সচেতন অলৌকিক কোনো শক্তি কাজ করছে - এমন ধরে নেব? ভালো করে লেখাপড়া করলে পরীক্ষায় ভালো ফল করা যায়। আর পড়াশুনো না-করে শুধুই প্রার্থনা করলে কি একই রকম হবে?

প্রথম প্রশ্নটা জগৎ নিয়ে, দ্বিতীয়টা জীবন নিয়ে। কোনো একটা মত মতো ঠিক করতে হবে। সেইমতোই তো চলব। কোন্ মতটা বেছে নিচ্ছি সেই অনুযায়ী ঠিক হয় কোন্টা আমার দর্শন।

দর্শন জেনে কী হয়?

আচ্ছা, দর্শন ছাড়া কি জীবন চলে না? কত লোক তো দর্শন ছাড়াই দিব্যি বেঁচে আছে। আমাকেই খামোখা একটা দর্শন ঠিক করতে হবে কেন?

আসলে সকলেই একটা-না-একটা দর্শন নিয়ে চলেন। সেটা তাঁরা নিজেরাও জানেন। জিগেস করলুম, ''আপনি এত আংটি পরেছেন কেন মশাই?''

মুচকি হেসে তিনি বললেন, ''হেঁ হেঁ বাবা। চারধারে কত রকমের আপদ বিপদ। জ্যোতিষী দেখে বলেছেন, শনি একেবারে ওৎ পেতে রয়েছে। তার ওপর রাহুর দৃষ্টি। তাই গোটা কয়েক পলা, গোমেদ, নীলা ধারণ করেছি। নইলে প্রাণে বাঁচতাম কিনা সন্দেহ।''

এই লোকটিকেই যদি জিগেস করতুম, ''মশাই, আপনার কোনো দর্শন আছে?'' ভদ্রলোক নির্ঘাত ধরে নিতেন আমার মাথা খারাপ। হয়তো বা, একটু করুণা করে বলতেন, ''আমি মরছি নিজের জ্বালায়, আর আপনি কিনা দর্শনের কথা জিগেস করছেন! না মশাই, আমি কোনো দর্শনের ধার ধারি না।''

কথাটা কিন্তু ঠিক হলো না। যদি কেউ মনে করেন, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র মানুষের জীবনের সব কিছু - চাকরি - বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য - ঠিক বা বেঠিক করে দেয়, তিনি নিশ্চয়ই একটা দর্শনে বিশ্বাস করেন। সেটি হলো: দৈব বলে একটা ব্যাপার আছে। প্রত্যেক মানুষকে সেই দৈবই চালায়। তার মানে, অলৌকিক বা অতিমানুষিক একটা কিছুতে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস যাঁর আছে, তিনি একভাবে চলেন। যাঁর নেই, তিনি চলেন অন্যভাবে। গ্রহশান্তির জন্যে তিনি জ্যোতিষীর কাছে ছুটবেন না, হাতে আংটি পরে ঘুরবেন না।

এই হলো দুটো আলাদা দর্শন। দু-রকমের বিশ্বাস, দু-রকমের ভাবনা। নিজেরা না-জানলেও দুটো আলাদা দর্শন মেনে তাঁরা চলছেন।

তাহলে, জান্তে বা অজান্তে, সকলেরই কোনো - না - কোনো দর্শন আছে। দর্শন ছাড়া জীবনে এক পা-ও চলা যায় না।

আরও একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। বাবার কথামতো পরীক্ষার আগে নিমাই রোজ প্রার্থনা করে: ''ঠাকুর, পরীক্ষায় যেন ভালোভাবে পাশ করি।'' সুকুমার ওসব কিছুই করে না, শুধু লেখাপড়াটাই করে। নিমাই বেশ নিশ্চিন্তে আছে। বই-এর পাতা ওল্টানোরও দরকার নেই। এত প্রার্থনার ফল ফলবেই।

ফল দাঁড়াল উল্টো। তখন নিমাই-এর বাবাই তাকে কষে বকুনি দিলেন।

মনে হতে পারে : এরকম বোকামো কেউ করে নাকি? প্রার্থনা কর আর না কর, পড়তে তো হবেই। নিমাই যদি প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে খানিক পড়াশুনোও করত, তবে তার এই দুর্গতি হতো না। সুকুমারের মতোই দিব্যি পাশ করে যেত।

আবার দেবিকা খুব সাবধানী মেয়ে। সে প্রার্থনাও করে, পড়াশোনা করে। পাশও করে যায়। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?

অক্ষয়কুমার দত্তর কায়দায় এইভাবে লেখা যায়:

প্রার্থনা + পড়াশনো = পাশ

পড়াশুনো = পাশ

প্রার্থনা = ০

(অক্ষয়কুমারের সমীকরণে 'পড়াশুনো'-র জায়গায় ছিল 'পরিশ্রম' আর 'পাশ'-এর জায়গায় 'শস্য')

যারা প্রার্থনা আর পড়াশুনো দুইই চালায়, তারা দু'নৌকায় পা দিয়ে থাকে। লাগে তুক্ না লাগে তাক্। অথচ ব্যাপারটার সঙ্গে তুক্তাকের কোনো সম্পর্ক নেই।

এটা যে বোঝে সে একটা দর্শন মেনে চলে। যেমন চলে সুকুমার। আর একটা যে বোঝে না, নিমাই-এর মতো সে বেকুব বনে। আর দেবিকা হয়তো ভাবে: দু'দিক রেখেছিলুম বলেই উতরে গেলুম।

তিনজন, তার মানে, তিন দর্শনে বিশ্বাসী; নিজের না জানলেও, তিনজনই একটা - না - একটা দর্শন ধরে চলছে।

এইবার তাহলে আমরা গোড়ার প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারি।

দৈববিশ্বাসী হলে কিছু না - বুঝেই জীবন কাটানো যায়। দৈবে আধা - বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে সেটুকুই যথেষ্ট নয়। দৈবর পাশাপাশি পুরুষকার, অর্থাৎ উদ্যম, চেষ্টা ইত্যাদিকেও স্বীকার করতে হয়। আর দৈবে পুরোপুরি অবিশ্বাসী হলে, পুরুষকারকেই একমাত্র সত্যি বলে মানতে হয়। সমস্ত ঘটনার পেছনে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে, অকারণে কিছু ঘটে না -

একথা বুঝতে হয়। তাহলে আর দৈববিশ্বাসীর মতো না-বুঝে কিছু করতে হয় না। সবাই করছে, আমিও তাই করছি - এই ভাবটা চলে যায়। বরং কী করছি, কেন করছি, কী করলে কী হয় - এই ব্যাপারগুলো স্পষ্ট ধারণা নিয়ে এগিয়ে চলা যায়। এই জন্যেই সঠিক দর্শন স্থির করা দরকার। অজান্তে যা করেছি, ঠিকমতো জেনেবুঝে তা করতে হয়।

সুকুমার যেমন জানে, পরীক্ষাটা পড়াশুনো করেই দিতে হয়। নিমাই ভেবেছিল, ভগবানই তরিয়ে দেবেন। দেবিকা কোনো ঝুঁকি নেয় নি, দু-দিকেই তাল রেখেছে। এর থেকে যদি কিছু শেখার থাকে, সেটা সুকুমার শিখবে: প্রার্থনা না করলেও পাশ করা যায়। বারবার ঠেকে নিমাইও হয়তো একদিন তা শিখবে। দেবিকা বোধহয় কিছুই শিখবে না। অসুখ হলে ওষুধও খাবে, চন্নামেত্তরও খাবে। কিসে রোগটা সারল সেটা আর জানবেই না।

সচেতনভাবে সঠিক দর্শন নিয়ে চললে অযথা হতাশ হতে হয় না বা সুবিধাবাদকে আঁকড়ে থাকতে হয় না।

নিমাই, সুকুমার আর দেবিকা তিনটে দর্শন নিয়ে চলছে। কিন্তু তিনটেই একই সঙ্গে ঠিক দর্শন হতে পারে না। পরে আমরা দেখব দর্শনেরও ঠিক-বেঠিক আছে।

দর্শন এল কোত্থেকে?

তাহলে, দেখা যাচ্ছে, জীবনে চলতে ফিরতে, কিছু করতে বা না - করতে দর্শন জিনিসটা থাকতেই। হয়তো সবাই সেটা টের পাচ্ছে না।

এইভাবেই, ভালো করে টের পাওয়ার আগেই, দর্শন জিনিসিটা এসে গিয়েছিল। অনেক, অনেক আগের কথা বলছি। মানুষ তখন অসহায়। বাঘের মতো ধারালো দাঁত নেই, মোষের মতো শিং নেই, সিংহের মতো গায়ের জোর নেই, সাপের মতো বিষ নেই, হরিণের মতো ছুটতেও পারে না, গণ্ডারের মতো গায়ের চামড়াও নেই।

তাহেল, সে বাঁচবে কিসে?

পাশাপাশি দুটো জিনিসই চলতে থাকে: এক, পাথর ঘষে অস্ত্র তৈরি করা। তাই দিয়ে বনের পশু শিকার করা হবে, তার মাংস খাওয়া হবে, তার চামড়া গায়ে দেওয়া যাবে। দুই, প্রকৃতির নানা শক্তির কাছে প্রার্থনা করা। যাতে বিপদ - আপদ থেকে রেহাই পাওয়া যায়, আর রোজকার খাবার জোটে।

তার মানেই দুটো দর্শন এসে গেছে। প্রথমটা নিজের ওপর ভরসা করা, দ্বিতীয়টা কোনো অজানা শক্তির কাছে মাথা নোয়ানো।

মানুষ যত এগিয়েছে, ততই সমস্যা বেড়েছে। প্রশ্ন উঠেছে অনেক। তার উত্তর দেওয়ারও চেষ্টা হয়েছে নানাভাবে। তার থেকেই গড়ে উঠেছে এক-এক জাতের দর্শন।

দর্শন কি এক না অনেক?

আমরা দু-ধরণের দর্শনের কথা বলেছি। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের মতো দর্শন বলতে নির্দিষ্ট, প্রমাণিত জ্ঞানের জগৎ বোঝায় না। আবার ইতিহাস বা ভুগোলের মতো ঘটনা বা জল-মাটির বিবরণও তা নয়। এখানে নানা মুনির নানা মত।

একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক : দর্শন কী? 'জগৎ ও জীবনকে নানাভাবে দেখা যায়। তার থেকে তৈরি হয় এক এক ধরণের দর্শন।' অর্থাৎ দর্শন এক নয়, অনেক। সমস্তটাই নির্ভর করছে কে কেমনভাবে দেখছে তার ওপর।

'অনেক' বললেই প্রশ্ন ওঠে : কটা? গুন্‌তি করে বলা কঠিন। কখনও বা এক - একজন লোকের নামে দর্শনের নাম হয়। যেমন - বৌদ্ধ দর্শন, প্লেটোর দর্শন, হেগেলের দর্শন, মার্কসীয় দর্শন। কখনও বা মতটিকে কেন্দ্র করেই নামকরণ করা করা হয়েছে। যেমন - সাংখ্য দর্শন (সংখ্যা থেকে এর নাম), বেদান্ত দর্শন, ইওরোপের অস্তিত্ববাদ, প্রয়োগবাদ ইত্যাদি। নামের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। প্রত্যেকটা দর্শনই অন্য সবার থেকে আলাদা। তবু, মোটের ওপর সমস্ত দর্শনকেই দুটো ভাগে ভাগ করা যায়: বস্তুবাদী আর ভাববাদী। বস্তুবাদের মধ্যেও নানা দর্শন থাকে। ভাববাদের মধ্যেও তাই। একেবারে মূলে গিয়ে দুটো ভাগ করা হচ্ছে।

বস্তুবাদ আর ভাববাদ

বস্তুবাদ বলতে কী বোঝায়? বস্তু কথাটাই বড় গোলমেলে। জল, মাটি তো বস্তুই। কিন্তু বাতাস? আবার গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ এদের তো প্রাণ আছে। এদেরও কি বস্তু বলা হবে?

হ্যাঁ, চোখ, কান, নাক, জিভ, চামড়া - এই পাঁচটি মানুষের ইন্দ্রিয়। এর যে-কোনো একটা (বা একের বেশি) দিয়ে কোনো বিষয় সম্বন্ধে যদি আমরা জানতে পারি, সেটাই বস্তু। যেমন, রাস্তায় চলতে হর্ন -এর আওয়াজ শুনলে আমরা বুঝে নিই: পেছনে একটা গাড়ি আছে। চোখ বুজে পথ হাঁটলেও গন্ধ দিয়েই জানতে পারি: আশেপাশে কোথাও চাওমিন ভাজা হচ্ছে। বাতাস দেখতে পাই না বটে, তবে গায়ে লাগলে বুঝতে পারি সেটা গরম না ঠাণ্ডা। সচেতনই হোক, আর অচেতনই হোক, কোনো-না-কোনো ভাবে মানুষের ইন্দ্রিয় দিয়ে যাকে ধরা যায় - সেটাই বস্তু। চেতনা না থাকলেও বস্তু হতে বাধা নেই। আবার চেতনা থাকলেই সেটা বস্তু ছাড়া অন্য কিছু হয়ে যায় না।

চেতনা ছাড়াও বস্তু থাততে পারে, কিন্তু বস্তু ছাড়া চেতনা থাকে না। বস্তু আগে চেতনা পরে।

এইখান থেকে যে দর্শনের যাত্রা শুরু, তার নাম বস্তুবাদ।

এর উল্‌টো মতটার নাম ভাববাদ। ভাববাদের মতো, বস্তু ছাড়াও চেতনা থাকতে পারে। তবে, তাকে শুধু চেতনা বলা হয় না, বলা হয় আত্মা। শরীর ছাড়াও তা দিব্যি থাকতে পারে।

শরীরের জরা দেখা দেয়, ক্ষয় হয়, কিন্তু আত্মা নাকি অজর, অক্ষয়।

বস্তুবাদ বলে : বস্তুতে চেতনা থাকলে তবেই জ্ঞান, বুদ্ধি ইত্যাদির কথা ওঠে। ভাববাদ বলে : দেহ ছাড়াও আত্মা বলে একটা ব্যাপার আছে। সেটাই চেতনার জ্ঞান, বুদ্ধির উৎস। প্রতিটি মানুষের এরকম আলাদা আলাদা আত্মা আছে, তার নাম জীবাত্মা। সব জীবাত্মাই এসেছে এক পরমাত্মা থেকে। আত্মা আছে, তার নাম জীবাত্মা। সব জীবাত্মাই এসেছে এক পরমাত্মা থেকে। আত্মার কোনো দেহ না থাকলেও চলে। তবে, যখন তা কোনো দেহে এসে আশ্রয় নেয়, তখনই দেখা দেয় চেতনা। মৃত্যু হলে চেতনা চলে যায়। দেহটা তখন আর পাঁচটা জড়বস্তুর মতো পড়ে থাকে। কিন্তু আত্মা? সে অমর। আবার কোনো দেহে আশ্রয় না নিয়ে সে ঘুরে বেড়াতে পারে। তাই আত্মাই আগে, বস্তু পরে। এই যে মত - এর নাম ভাববাদ।

সব ভাববাদীই যে একই শব্দ ব্যবহার করেন তা নয়। যেমন, পরমাত্মার জায়গায় কেউ হয়তো বলেন ঈশ্বর, কেউ বা গড, কেউ বা আল্লাহ। ঘটনাটা কিন্তু একই। সেই আত্মাই সাকার হন বা নিরাকারেই থাকেন। তিনিই সব বস্তুর - সচেতন বা অচেতন - উৎস। তাই চেতনা আগে, বস্তু পরে।

পাঁচিলের ওপর বসে থাকা

বস্তুবাদ হলো একটা স্পষ্ট দর্শন। ভাববাদও তাই। দুটোর এলাকা পুরোপুরি আলাদা। মধ্যে একটা বিরাট উঁচু পাঁচিল। টপকানোর জো নেই।

এই সুযোগে কিছু লোক পাঁচিলটার ওপর বসে থাকেন। তাঁরা বলেন: আমরা, বাবা, বস্তুবাদীও নই, ভাববাদীও নই। বস্তু আগে না চেতনা আগে - তা কোনোদিনই জানা যাবে না। ভগবান আছেন না নেই তাও ঠিক জানা যায় না। সুতরাং এসব ব্যাপারে কোনো মতামতই দেব না।

এই ধরণের লোকদের বলা হয় অজ্ঞেয়বাদী বস্তুবাদের দিকেই ঝুঁকে থাকেন, কিন্তু কিসের লজ্জায় যেন সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না। কিছু সংশয়বাদী আবার সংশয়কেই আঁকড়ে থাকেন: কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে চান না।

এর আগে নিমাই, সুকুমার আর দেবিকার কথা বলা হয়েছে। নিজেদের অজান্তে তারা তিনটি দর্শন মেনে চলছিল। নিমাই ভাববাদী, সুকুমার বস্তুবাদী আর দেবিকা অজ্ঞেয়বাদী।

জগৎকে জানার জন্যে বস্তুবাদের মূল সহায় হলো বিজ্ঞান, অর্থাৎ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূ-তত্ত্ব, জীববিদ্যা ইত্যাদি। ভাববাদ শুধু মাথা খাটিয়েই জগতের স্বরূপ বুঝতে চায়। কতগুলো স্বতঃসিদ্ধ থেকে কিচু যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত টানতে পারলেই তার কাজ শেষ। বিজ্ঞান থেকে পাওযা প্রমাণের সঙ্গে তা মিলল কিনা - সেটা দেখার দায় তার নেই।

দর্শন ও বিজ্ঞান

এই সেদিন পর্যন্ত, মানে আঠেরো শতকেও বিজ্ঞান বা সায়েন্‌স্ কথাটার চল ছিল না। প্রকৃতিকে জানার বোঝার যে চেষ্টা - এখন যাদের নাম পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি - তাকে বলা

হতো : প্রাকৃতিক দর্শন, 'ন্যাচরাল ফিলজফি'।

এর থেকেই বোঝা যায় : দর্শন আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রটা আলাদা নয়। এখন অবশ্য দুটিকে আলাদা বিষয় বলে ধরা হয়। বিজ্ঞান বলতে গত তিনশ বছরে দুটো ব্যাপার বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। একটি হলো অঙ্ক, অন্যটি হলো উন্নত যন্ত্রর সাহায্যে খুঁটিয়ে দেখা, পরীক্ষা করা।

উন্নত যন্ত্র মানে দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ ইত্যাদি। প্রথমটা কাজে লাগে জ্যোতির্বিদ্যায়, দ্বিতীয়টা জীববিদ্যায় ও আরও নানা ক্ষেত্রে।

শুধু উন্নত যন্ত্রপাতিই নয়, যে-কোনো বৈজ্ঞানিক ধারণা পরখ করে দেখার জন্যে নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের অনেক নিয়মনীতি তৈরি করতে হয়েছে। এইসব মিলিয়েই তৈরি হয় বিজ্ঞানচর্চার নিজস্ব জগৎ। শুধু মাথা খাটালেই, যুক্তিসঙ্গত হলেই চলবে না, বারবার পরীক্ষা করে যখন একই ফল পাওয়া যাবে, তখনই কোনো তত্ত্বকে সত্যি বলে মানা হবে।

দর্শন আর বিজ্ঞান যখন এক ছিল তখন এত উন্নত যন্ত্র ছিল না, অঙ্করও এত উন্নতি হয় নি। যখন থেকে প্রকৃতিতে বোঝার এইসব নতুন কায়দা-কানুন তৈরি হলো, তখন থেকেই দর্শন আর বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়াল দুটি আলাদা বিষয়।

তাই বলে দু-এর মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল - এমন নয়। বরং একে সাহায্য করল অন্যকে। বস্তুবাদী দর্শন বিজ্ঞানের ভিত। আবার বিজ্ঞানের আবিষ্কার করা তথ্যই শক্তিশালী করে বস্তুবাদকে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রাচীন ভারত ও গ্রীসের ভাববাদী দার্শনিকরা (শঙ্করাচার্য, আরিস্তোতল) পরমাণুর ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। অথচ প্রাচীন ভারত ও গ্রীসের অন্তত দু-জন দার্শনিক (কণাদ, ডেমক্রিটাস) পরমাণুকেই সব বস্তুর মূল বলে মনে করতেন। মুশকিল একটাই : কথাটা প্রমাণ করার কোনো উপায় ছিল না। ফলে শুধু তক্ক আর পাল্টা তক্ক। কিন্তু ডাল্টন যখন পরমাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন, তখন জিতল বস্তুবাদ। শঙ্করাচার্য বা আরিস্তোতল-এর কথা ধোপে টিকল না।

বিজ্ঞানের শেষ, দর্শনের শুরু?

কেউ কেউ বলেন: বিজ্ঞান যেখানে শেষ, সেখান থেকেই দর্শনের শুরু। বেশ গম্ভীর সুরে কথাটা বলা হয়। এর একটা সুবিধেও আছে: বিজ্ঞান আর দর্শনকে দুটো আলাদা ব্যাপার হিসেবে দেখা যায়। আবার দর্শন যে বিজ্ঞানের চেয়ে এগিয়ে থাকা বিষয় - এটাও বলে দেওয়া হয়

ঘটনা কি তাই? আমরা আগেই দেখেছি, একেবারে গোড়ায় দর্শন আর বিজ্ঞান দুটো আলাদা ব্যাপার ছিল না। দর্শনের মধ্যেই ছিল বিজ্ঞানের স্থান। প্রকৃতিকে জানার কাজ যত এগিয়েছে শুধু চোখে দেখার স্তর ছাড়িয়ে অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, পরীক্ষা - নিরীক্ষা ইত্যাদি দিয়ে অনেক বেশি জানা যাচ্ছে। তারপরে 'প্রাকৃতিক দর্শন' থেকে বিজ্ঞানের নানা শাখা আলাদা হয়েছে। এর মধ্যে কারও শুরু বা শেষের ব্যাপার নেই।

তাহলে কথাটা বলা হয় কেন? অন্য দিক দিয়ে সেটা বোঝা যায়। ভাববাদী দর্শনের ধারণাগুলোকে বিজ্ঞান যখন এক - এক করে বাতিল করতে থাকল (যেমন, পৃথিবী অচল), তখনই ভাববাদীরা প্রমাদ গনলেন। এর থেকেই এমন একটা প্রচার শুরু হলো: বিজ্ঞান আর কতটুকু বলতে পারে? তার পরেও কিছু থাকে। সেটাই হলো দর্শনের আসল এলাকা।

ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক এর উল্টো। বিজ্ঞানের কাছে পদে পদে অপদস্ত হয়ে ভাববাদীরা আশ্রয় খুঁজলেন বিজ্ঞানছাড়া এলাকায়। কিন্তু যা সত্য তা বিজ্ঞানেরও সত্য, দর্শনেরও সত্য। বিজ্ঞান ছাড়িয়ে আলাদা কোনো সত্য নেই। বিজ্ঞান এখনও যে সব তথ্য জানতে পারে নি, দর্শনও তা জানতে পারে না এর জন্যেই বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্পর্ক নিয়ে ঐ গুরুগম্ভীর বাণীটিকে অসার বলেই ধরা উচিত।

দর্শন ও ধর্ম

ধর্ম বলতে কী বোঝায়? এ নিয়েও নানা মুনির নানা মত। কোনো একটা সংজ্ঞার্থ দিয়ে সব ধর্মকে তার আওতায় আনাও কঠিন।

কাজের সুবিধের জন্য আমরা তিনটে ধর্মমতকে বেছে নিচ্ছি : হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম আর খ্রিষ্টধর্ম। এই তিনটে ধর্মর মধ্যে যে অনেক তফাত আছে - সে তো সাদা চোখেই দেখা যায়। যেমন, হিন্দুধর্মে দেবতার সংখ্যা অনেক; কেউ কেউ বলেন, তেত্রিশ কোটি। এক-একজন মানুষ এর মধ্যে থেকে একজন, বা দুজন, বা পাঁচজন বা আরও বেশি দেবতার ভক্ত। যেমন, কালীভক্ত (শাক্ত), কৃষ্ণভক্ত (বৈষ্ণব), শিবভক্ত (শৈব) ইত্যাদি।

খ্রিস্টধর্মে ও ইসলামে কিন্তু একের বেশি দেবতার কথা ভাবাই বারণ। এই দেবতা আবার সাকার নন, নিরাকার। তাহলেও খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের মধ্যে তফাত আছে। ইসলামে হজরত মহম্মদকে 'নবী' (ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ) বলে ঘোষণা করা হয়। খ্রিস্টানরা তা মানেন না। তাই এক ধর্মে বিশ্বাসীরা অন্য দুটো ধর্মকে মিথ্যাধর্ম বলে মনে করেন।

তবে আবার এই তিন ধর্মর মধ্যে কয়েকটা মিলও আছে। যেমন, এক বা একাধিক দেবতা এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন; প্রত্যেক ধর্মমতেরই একটি পবিত্র বই আছে (বেদ, বাইবেল, কোরান), তার প্রতিটি কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য, সে নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার কারও নেই। পুণ্যকর্ম করলে মরার পর লোকে স্বর্গে যায়, পাপ করলে যায় নরকে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধর্মমতের সঙ্গে যুক্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো ধর্মমত মানা বা না-মানার প্রথম ও প্রধান কারণ হলো বিশ্বাস। সে - বিশ্বাস -এর পেছনে কোনো অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি কাজ করে না। ছোটোবেলা থেকেই পরিবেশের প্রভাবে বহু মানুষ তাঁর পরিবার পরিজন যে ধর্মে বিশ্বাস করেন, সেই ধর্মকেই সত্য ধর্ম বলে ধরে নেন। কেউ কেউ হয়তো পরে, বড় হয়ে পারিবারিক ধর্মমতে বিশ্বাস হারান, আর আশ্রয় নেন অন্য ধর্মর। হিন্দু থেকে মুসলমান বা খ্রিস্টান হন; খ্রিস্টান থেকে হন মুসলমান। অর্থাৎ, এক ধর্মবিশ্বাসের বদলে আসে আর -এক ধর্মবিশ্বাস। বিশ্বাস কিন্তু বিশ্বাসই রইল, ধর্মর বদলে অন্যকিছু তার জায়গায় এল না।

এর সঙ্গে দর্শনের কী সম্পর্ক?

ঠিকমতো বলতে গেলে, কিছুই নয়। বিজ্ঞান ও দর্শনকে নতুন নতুন প্রশ্নর মোকাবেলা করতে হয়। কিন্তু ধর্মর সে-দায় নেই। পবিত্র বই-এ সব কথাই বলা আছে; নতুন কিছু হয় না বা হবে না।

যেমন ধরা যাক, হিন্দুধর্ম। আগেই বলা হয়েছে, এর মধ্যেও নানা ভাগ আছে - বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, কিন্তু 'পুতুল পুজো'তেও আপত্তি করেন না। সকলেই চান মুক্তি। 'মুক্তি' মানে সমস্ত রকম দুঃখ - দুর্দশার থেকে মুক্তি, পুনর্জন্মর হাত থেকে রেহাই পাওয়া। যে-দর্শনগুলোকে আস্তিক দর্শন বলা হয় সেখানেও একই কথা বলা হয়েছে। সকলেই দাবি করেন: এই দর্শন জানলে মুক্তি হবে।

তবে তো ধর্ম আর দর্শনের মধ্যে কোনো তফাত থাকার কথা নয়। কিন্তু কাজে কি তাই হয়? এক দর্শনের সঙ্গে অন্য দর্শনের খিটিমিটি লেগেই আছে। বেদান্তর সঙ্গে ন্যায়ের ঝগড়া কখনোই মেটার নয়। আর বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে তার বিরোধীরা ঠাট্টা করে বলেছেন : সুন্দর বৃন্দাবনে বরং শেয়াল হয়ে ঘুরব, তবু বৈশেষিক মতে মুক্তির প্রার্থনা কখনও করব না।

এমন কথা উঠছে কেন? বৈশেষিক দর্শনে মনে করা হয় : মুক্তি পেলে মানুষ ঢেলা ও পাথরের মতো জড় হয়ে পড়ে। আনন্দ বা দুঃখ - কোনো বোধই থাকে না। বৈষ্ণবরা মুক্তির মধ্যে দিয়ে আনন্দ পেতে চান। তাই এত আপত্তি। তাঁরা বলেছেন : অমন মুক্তি পেয়ে কী হবে? তার চেয়ে শেয়াল হয়ে ঘুরে বেড়ানো ভালো।

এর থেকে বোঝা যায়, মুক্তি বলতে সকলে এক জিনিস বোঝেন না। শুধু 'যত মত তত পথ' নয়, যত পথ তত লক্ষ্য।

এর থেকে আরও একটা জিনিস বোঝা যায়: দর্শন আর ধর্মকে এক লক্ষ্যে দাঁড় করাতে গিয়ে এত ঝামেলা হয়েছে। ধর্মর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এমন দর্শনও ভারতে ছিল। যেমন, বস্তুবাদী চার্বাক/ লোকায়ত দর্শন। আর ভারতের বাইরে দর্শন আর ধর্মকে এমনভাবে এক করার কোনো ঝোঁকও দেখা যায় না।

কারণটাও পরিষ্কার। পুনর্জন্ম মানলেও তবেই তার থেকে মুক্তির কথা ওঠে। যাঁরা পুনর্জন্ম মানেন না তাদের কাছে মুক্তি ব্যাপারটাই অবান্তর।

ধর্ম আর দর্শনকে তাই দুটি আলাদা বিষয় বলেই ধরা উচিত। তবে সব ধার্মিকই যে কোনো-না-কোনো ভাববাদী দর্শন অনুসারে চলেন, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। ধার্মিক লোক কখনও অজ্ঞেয়বাদী বা সংশয়বাদী হতে পারেন না, বস্তুবাদী তো নয়ই।

শেষ কথা (আপাতত)

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়াল?

১. দর্শন হলো জগৎ ও জীবনকে কীভাবে দেখব জানব - তার নিশানা।

২. দর্শন না জানলে জীবনের পথে ঠিকমতো চলাই যায় না। দর্শন থাকলে তবেই সেই অনুযায়ী ঠিক-ভুল, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি ঠিক করা যায়। চান বা না চান, সব মানুষেরই একটা-না-একটা দর্শন থাকে।
যে যাঁর দর্শন অনুযায়ী জীবনের পথে নানারকমের সিদ্ধান্ত নেন। এ-ব্যাপারে প্রাচীন ও আধুনিক মানুষের কোনো তফাত নেই।

৩. প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ তার পরিবেশ, আশেপাশের মানুষজন ইত্যাদি জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেছে। সেই চেষ্টা থেকেই দর্শনের শুরু। এক-একটি বিষয়কে আলাদা করে না -ধরে যখন সচেতনভাবে একটা নির্দিষ্ট চিন্তার কাঠামোয় ধরা হয়, তারই নাম দেওয়া হয় দর্শন।

৪. কিন্তু সব মানুষ সব কিছুকে একভাবে দেখেন না। দেখার ধর অনুযায়ী সিদ্ধান্ত অনেকরকমের হয়। তাই দর্শন বলতে একটাই ভাবনা বোঝায় না। দর্শন এক নয়, অনেক। দর্শন অনেকরকম হতে পারে। তবু মোটের ওপর দুটো ভাগ করা যায়: বস্তুবাদ আর ভাববাদ। বস্তুবাদ বলে: আগে বস্তু, তারপর চেতনা; বস্তু না থাকলে চেতনা থাকতে পারে না। ভাববাদ বলে : আগে চেতনা, তারপর বস্তু; বস্তু না থাকলেও চেতনা থাকে।

৫. দর্শন আর বিজ্ঞান আদতে দুটি আলাদা বিষয় ছিল না। বিজান ছিল দর্শনেরই অঙ্গ। তারপর, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিকাশের ফলে, বিজ্ঞান একটি আলাদা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
কিন্তু বিজ্ঞানেরও পেছনে দর্শন থাকে। তাই এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্কটা শত্রুতার নয়, সহযোগিতার।

৬. দর্শন আর ধর্ম দুটি আলাদা ব্যাপার। ধর্মের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো ভাববাদী দর্শন থাকে, কিন্তু ধর্ম না থাকলে দর্শনের লাভ বা ক্ষতি কোনোটাই হয় না।

এই হলো দর্শনের বর্ণপরিচয় (প্রথম ভাগ)। এরপর দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ... অনেক কিছু থাকবে। আপাতত আশা করি এই প্রথম ভাগ থেকে দুটো কথা স্পষ্ট হয়েছে।

ক) দর্শন বিষয়টা শুধু কয়েকজন দাশনিক বা দর্শনের ছাত্রর একচেটিয়া নয়। আমাদের প্রত্যেকেরই, নিজের অজান্তে হলেও, কোনো-না-কোনো দর্শন থাকে।

খ) সব মানুষ কিন্তু গুছিয়ে নিজের দর্শন নিয়ে ভাবেন না। অথচ সেটা না করলে এক-এক ধাক্কায় এক - এক বার এক - এক দিকে ঝুঁকতে হয়, বা লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে বেড়াতে হয়। তার জন্যেই, সকলেরই সচেতনভাবে নিজের নিজের দর্শন ঠিক করা উচিত।